হিন্দু কলেজ
থেকে
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথ্বীরাজ সেন

বাংলার দুশো বছরের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার তথ্যসমৃদ্ধ উপস্থাপনা ও
প্রায় তিনশো জন মহাপ্রয়াত বিশিষ্ট প্রেসিডেন্সিয়ানের বর্ণময় জীবনকথা

পুনশ্চ

প্রস্তাবনা

যে বিদ্যানিকেতনটি গত দুশো বছর ধরে ভারতসংস্কৃতির প্রতিভূস্বরূপ বিরাজিত, যে সংস্থার হাত ধরে ভারতের বুকে সাংস্কৃতিক নব জাগরণের শুভ সূচনা হয়েছিল, যে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে, চিত্রকলায় কিংবদন্তীর মহানায়ক হয়ে উঠেছেন সেই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক দুশো বছর পূর্তিতে প্রাক্তন প্রেসিডেন্সিয়ান পৃথ্বীরাজ সেনের লেখা এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। লেখক নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে দুশো বছরের বাঙালি মানসিকতার পরিবর্তনের রূপরেখাটি বিবৃত করেছেন—তাঁর এই উদ্যম প্রশংসনীয়। এ কথা অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র উপায় নেই যে কালের প্রেক্ষাপটে সমকালীন পরিস্থিতি অনেকখানি পাল্টে গেছে। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি যে সামাজিক পরিমণ্ডল এবং রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে হিন্দু কলেজ তার শুভযাত্রা শুরু করেছিল, আজ সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি একেবারে অন্যরকম। দীর্ঘ দুশো বছর ধরে ভারত প্রত্যক্ষ করেছে ইতিহাসের নানা ঘাত প্রতিঘাত। ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবনে তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছে। দেখতে দেখতে স্বাধীনতার বয়েস হল প্রায় সত্তর বছর। আজ আমাদের দেশ বিশ্ব-অঙ্গনে এক উদীয়মান শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে তার ঐতিহ্যবাহিত পরম্পরার উজ্জ্বল দিকচিহ্নগুলি। ইতিমধ্যে ঘটে গেছে বৈদ্যুতিন্ মাধ্যমের বিস্ফোরণ। এই মুহূর্তে মানুষ হয়ে উঠেছে ইনটারনেটনির্ভর। জানতে ইচ্ছে করে, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে মানিয়ে নিয়েছে।

কোনো কোনো উন্নাসিক সমালোচক মনে করেন, আজ সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয় সূচিত হয়েছে, একদা যে ভারত—মনীষা বিশ্বজয় করেছিল, আজ পড়ে আছে তার ব্যথার্ত স্মৃতি। আমি সেই দলভুক্ত নই। আমি মনে করি, আজও ভারত—মনীষার নবীন ধারক এবং বাহকেরা তাঁদের বৌদ্ধিক সৃজনশীলতার প্রদীপ জ্বেলে বিশ্বকে আলোক-উদ্ভাসিত করে চলেছেন। আর এই তালিকাতে আছেন বেশ কিছু স্বনামধন্য প্রেসিডেন্সিয়ান।

এই গ্রন্থে শ্রীসেন আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেছেন। দীর্ঘ দুশো বছরে প্রেসিডেন্সি কলেজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একাধিক বরেণ্য মানুষের দৃপ্ত মনন এবং নির্ভীক মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। একজন প্রেসিডেন্সিয়ান তাই অনায়াসে যে কোন অন্বেষু প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। এই বইএর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তিনশো জন মহাপ্রয়াত বরেণ্য প্রেসিডেন্সিয়ানের জীবনকথা। আশাকরি, এই বইটি আমাদের কাছে এক স্মরণীয় আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

জয়ন্ত কুমার মিত্র

সভাপতি, প্রেসিডেন্সি অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

সূচিপত্র

অবতরণিকা ১১

হিন্দু কলেজ [১৮১৭-১৮৫৫] ১৩

- উন্মেষ পর্ব ১৭
- হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ২৫
- হিন্দু কলেজের ধর্ম-নিরপেক্ষতা ৩১
- ঝড়ের পাখি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ৩৫
- আগুনের পাখি ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন ৪৭
- ইয়ংবেঙ্গল : স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ ৫৪
- শিক্ষা বিস্তারে আন্তরিক উদ্যোগ ৬৫
- ইয়ং বেঙ্গলের নৈতিকতা ৭০
- নাস্তিকতা বনাম নিরীশ্বরবাদ ৭৩
- রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ৭৬
- বাংলা সাহিত্য সাধনা ১০৪

প্রেসিডেন্সি কলেজ [১৮৫৫-২০১০] ১১১

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় [২০১০....] ১১৭

বিশ্ববরেণ্য প্রেসিডেন্সিয়ানদের বর্ণময় জীবনকথা ১২১

অবতরণিকা

এ এক অলৌকিক অভিযাত্রা—১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি ৩০৪ নং চিৎপুর রোডে ২০ জন ছাত্র নিয়ে যে হিন্দু কলেজের ক্লাস শুরু হয়, দুশো বছরের ব্যবধানে আজ তা ভারত তথা বিশ্বের অগ্রগণ্য শিক্ষানিকেতন হিসাবে পরিচিতি অর্জন করেছে। গত দুশো বছরে বাঙালির বৌদ্ধিক চিন্তন, সামাজিক পরিমণ্ডল, রাজনৈতিক বিন্যাস এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখায় গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। পৃথিবী একে একে অনেকগুলি স্মরণযোগ্য ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছে। মানুষের মনন এবং মানসিকতায় ঘটে গেছে ব্যাপক রূপান্তর। এইসব রূপান্তর বা পরিবর্তনের নীরব সাক্ষীস্বরূপ থেকেছে হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর আর কোনো দেশের কোনো একটি শিক্ষানিকেতন সমগ্র জাতির সাথে এইভাবে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি। হয়তো শুদ্ধ সারস্বত চিন্তার ক্ষেত্রে লন্ডনের অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিব্যাপ্তি অনেক বেশি, হার্ভার্ড অথবা মিশিগান বিশ্ববদ্যালয়ের যশ এবং অহংকার পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি তার অনন্যতা দাবি করতে পারে, তা হল সমস্ত বাঙালি জাতির বদলে যাওয়া মানসিকতার সঙ্গে নিজেকে এক করা। প্রেসিডেন্সি—এই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত শিহরণের জন্ম হয়, বিশেষ করে যে সব মানুষ জীবনে চলার পথে এই সুমহান বিদ্যানিকেতনটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতির সমুদ্রে টাইফুন দেখা দেয়। ক্ষণকালের জন্য তাঁরা পরিদৃশ্যমান পৃথিবী ছেড়ে তাঁদের মধুর ছাত্রজীবনে ফিরে যান। সত্যি কথা বলতে কী, প্রেসিডেন্সি কলেজ মানেই এমন এক প্রত্যয় বা অনুধ্যান, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আমি আমার ছাত্রজীবনের বেশ কিছুটা সময় বিশ্ববিখ্যাত এই শিক্ষাঙ্গনের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ বজায় রাখতে পেরেছিলাম। তখন সবেমাত্র অবসান হয়ে গেছে নকশাল আন্দোলন। কৃষ্ণচূড়ার দিনগুলির কথা তখনও বাতাস সমুদ্রে ভাসছে। এমনই এক ক্রান্তিকর মুহূর্তে আমার এই কলেজে প্রবেশ। এই কলেজে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে কেন একে বিশ্ববিদ্যানিকেতনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলা হয়। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেকে বিশ্ববাঙালি হওয়ার দৌড়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। কারও কারও নাম বিশ্ববিখ্যাত পুরস্কারের জন্য বারবার উচ্চারিত হয়েছে। আজ যখন দীর্ঘ চার দশকের ব্যবধানে আমি এইসব সহপাঠীদের কথা চিন্তা করি, তখন আমার সমস্ত চেতন ঘিরে এক আশ্চর্য অনুরণন স্পন্দিত হয়। একদা যে সদ্য তরুণ আমার পাশে বসে পদার্থবিজ্ঞানের লেকচার শুনত, সে আজ ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান। একদা যে প্রগলভা মেয়েটি কথায় কথায় রবীন্দ্র গান গেয়ে উঠত, সে আজ এক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার। আমার সহপাঠিনী প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয়া উপাচার্য—এর চেয়ে অহংকার ও গৌরবের বিষয় আর কী বা হতে পারে?

ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মধ্যে কখনও যদি আমি এই রহস্যময় শিক্ষাকেন্দ্রটিকে নিয়ে আসি তাহলে এর বিন্যাস এবং বিস্তার ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব হবে না। আমি ছিলাম চিরন্তন ভাবধারায় তৈরি সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। কলেজ স্ট্রিটের এ পারে প্রেসিডেন্সির অবস্থান। যখন অত্যন্ত কঠিন প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে এই কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম তখন মনে হয়েছিল—"মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ...আসিতে তোমার দ্বারে..."

এখনও কোনো এক ব্যস্ত মধ্য দুপুরে প্রেসিডেন্সি অঙ্গনে উপস্থিত হলে মেঘ মেদুরতায় মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এখনও সেই একই রকম আছে বিশাল এই অট্টালিকা। কিন্তু পরিবেশ একেবারে পালটে গেছে। আজকে যেসব ছাত্রছাত্রীরা পোর্টিকোতে বসে তুমুল বিতর্ক—'বব ডিলান বনাম পিট সিগার' নিয়ে এখন যারা হোয়াটসঅ্যাপে অনায়াসে হৃদয়ের না বলা কথা শেয়ার করতে পারে, মুহূর্তে মুহূর্তে লাইকের মাধ্যমে নিজের ভালোবাসার কথা জানাতে পারে, তখন কি তারা তেমন ছিল? তখনও ছিল ডাকবাক্স, রঙিন মাছ, নীল আকাশে ঘুড়ির সীমাহীন উৎসব। তখনও সিনেমাহল একেবারে হারিয়ে যায়নি। মাঝ দুপুরে আকাশবাণী স্পন্দিত হত পুরোনো দিনের বাংলা গানে। তখন আমাদের জীবনযাত্রায় ছিল অন্য এক মাদকতা। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক প্রজন্মই নিজের মতো করে বাঁচতে শেখার মন্ত্র শেখে সযত্নে। তাই তো সারা পৃথিবীর নিউ জেনারেশন বা নব প্রজন্ম একসূত্রে গাঁথা। আর অনেকে যেমন নিজের সময়সীমাকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে চিহ্নিত করে এক ধরনের আত্ম-অহংকার বোধ করেন, আমি কিন্তু সেই দলভুক্ত নই। আমি জানি প্রত্যেক তরুণ এবং তরুণীর নিজস্ব একটা গোপন জগৎ আছে। সেই জগতে অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ। ইদানীংকালের ওয়াই জেনারেশন আগের থেকে কম সৃজনমূলক, একথা মানতেও আমি রাজি নই। যতই বৈদ্যুতিন মাধ্যম তাদের আক্রমণ করুক না কেন, তাদের মধ্যে যথেষ্ট সৃজনশীল সত্তা থেকে যাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই সৃজনশীলতার প্রকাশও ঘটে যাচ্ছে।

আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, এই ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি লেখার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। আশা করি আমি সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গত দুশো বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে পারব এবং বাঙালির সামগ্রিক মানসিকতায় এই মহান শিক্ষাকেন্দ্রটি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব। তবে কোথাও কোথাও যদি ব্যক্তিগত আবেগ এসে তর্কের সীমারেখাকে মুছে দেয়, কোথাও যদি আমি আমার প্রিয় শিক্ষানিকেতনের প্রতি একটু বেশিমাত্রায় অনুরক্ত হয়ে পড়ি, তাহলে সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। জানেন তো, যখন স্মৃতির ক্যানভাসে একটির পর একটি ছবি আঁকা হয়, তখন সঙ্গত কারণেই মন কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যে ছবিগুলি চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে, যে মুখগুলি আর কখনও দেখতে পাব না, যে গান আর কখনও শোনা হবে না কিংবা যে কবিতা আর কখনও লেখা হবে না, আজ যদি তারা দলবদ্ধ মিছিল করে ফিরে আসে তাহলে কেমন হয়? তাহলে কি মহাকালকে স্তব্ধ করে আমরা ডুব সাঁতার কাটতে কাটতে ফিরতে পারব সত্তর দশকের সেই উত্তাল দিনগুলিতে? আবার কি গেয়ে উঠতে পারব জীবনের মহাসঙ্গীত—"উই শ্যাল ওভার কাম..."? আবার কি কফি হাউসে কাটবে দীর্ঘপ্রলম্বিত নিকোটনি মধ্য দুপুর? জানি না, জানি না এই ভাবে লেখার মাধ্যমে সবকিছু ক্ষণকালের জন্য ফিরে পাওয়া যায় কিনা। যদি নাই বা পাওয়া যায়, দুঃখ কী? জীবন তো এক বহমান তটিনী। এইভাবেই তো সে সাগর সন্ধানে এগিয়ে যাবে মোহনার দিকে।

এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে আমি অনেকের কাছ থেকে সাহায্য এবং সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের সকলকে এই উৎসবমুখরিত দিনে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অভিনন্দন।

ধন্যবাদান্তে পৃথ্বীরাজ সেন

হিন্দু কলেজ

১৮১৭ - ১৮৫৫

উন্মেষ পর্ব

যদিও সরকারি নথিপত্রে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখটি হিন্দু কলেজের শুভ জন্মদিন হিসাবে ধরা হয়েছে, কিন্তু যদি আমরা আনুপূর্বক বিবরণের ওপর নির্ভর করি, তাহলে বলতে হবে যে, ১৮১৬ সালের ২১ মে তারিখটিকে এই মর্যাদা দেওয়া উচিত। ওই দিন কলকাতার উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতির বাড়িতে বেশ কয়েকজন কৃতবিদ্য পুরুষের উপস্থিতিতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওই আলোচনা সভায় সভাপতি এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এবং সহ-সভাপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন ছাড়াও আটজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক এবং দু জন এদেশীয়কে নিয়ে একটি অস্থায়ী কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। এই কমিটি সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা হয়, এই কলেজের নামকরণ করা হবে হিন্দু কলেজ।

"At a general meeting of the principal Hindoo inhabitants of the town and vicinity of Calcutta, held this day at the house of the Hon. The Chief Justice, for the purpose of taking into further considerations the institution of a college for the national education of Hindoo children.

"If was resolved, 1st. That an institution for this purpose be established, and that it be called the Hindoo college of Calcutta."

এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ বিভিন্ন নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন, এশিয়াটিক জার্নাল অ্যান্ড মান্থলি রেজিস্টারের ডিসেম্বর, ১৮১৬ সংখ্যায় এই কথা পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে। এখানে কিশোরী চাঁদ মিত্র মন্তব্য করেছেন College was inangurated in 1816

রেভারেন্ড জেমস লঙ—আরও ভালোভাবে লিখেছেন—THE HINDU COLLEGE was projected near the close of the year 1815.

আর সরকারি নথিতে বলা হয়েছে—The Calcutta Hindoo College was formed in 1816 by the subscriptions and voluntary donations.

পরবর্তীকালে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমরা ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে ধরে নিয়েছি।

সে যুগের কিছু বাঙালি বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ বুঝতে পেরেছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন ইতিবাচক দিকগুলিকে গ্রহণ না করলে বাঙালি সমাজের সার্বিক উত্তরণ সম্ভব হবে না। এর

পাশাপাশি বেশ কয়েকজন ভারতহিতৈষী ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকও সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। শুরু হল চিৎপুর রোডে এই কলেজের প্রথম জয়যাত্রা। ২৩ জানুয়ারি ক্যালকাটা গেজেট-এ উদ্বোধন দিবসের একটি অত্যন্ত মূল্যবান বর্ণনা পাওয়া যায়। এ দেশীয়দের মধ্যে হাজির ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, হরিমোহন ঠাকুর, রাধামাধব ব্যানার্জী, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, মোহন প্রসাদ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষ। এছাড়া জে. এইচ. হ্যারিংটনের মতো এক কৃতবিদ্য পুরুষও এই দিনটিতে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন বালির ওপর কাঠি দিয়ে ছাত্ররা বর্ণমালা লিখতে শুরু করেছিলেন। এই পদ্ধতিটি প্রত্যন্ত ভারতে দেখা যায়। প্রথম দিন বেলা দেড়টায় ক্লাস ছুটি হয়ে গিয়েছিল। কমবেশি দু-ঘণ্টার মধ্যে এক ইতিহাস রচিত হয়। ভাবতে ইচ্ছা করে, সেদিন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেউ কি ভাবতে পেরেছিলেন যে পরবর্তী অনেক বছর ধরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু বঙ্গদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক অভিযাত্রার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে? এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বিশ্ব বাংলা তথা বিশ্ব ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবেন? আজ পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রান্তে সেইসব কৃতী মানুষদের উজ্জ্বল উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। আর এইভাবেই বোধহয় কিছু মানুষের স্বপ্ন আজ সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

পরের দিন ক্লাস হয়েছিল দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত, সেদিন পার্শী ভাষার পাঠ দেওয়া হয়। ছাত্র ছিলেন একুশ জন। সেদিন এই বিদ্যালয় দেখতে এসেছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি মন্তব্য করেছিলেন—"বটগাছের মতো হিন্দু কলেজও একদিন সামান্য থেকে বিশাল হয়ে উঠবে।"

প্রথম দিকে হিন্দু কলেজের জনপ্রিয়তা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। যাঁরা এই কলেজের ছাত্র অথবা শিক্ষক নন, তাঁদের মধ্যে অনেকে এই কলেজ দেখতে আসতেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এই কলেজ শিক্ষিত বঙ্গসমাজে কী ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৮১৮ সালে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন শিক্ষা প্রসারে নানাধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছিল। তাদের তরফ থেকে কুড়ি জন ছাত্রকে হিন্দু কলেজে পড়তে পাঠানো হয়। তাদের জন্য এই সংগঠন একশো টাকা করে অনুদান দিতে থাকে। ডেভিড হেয়ারের মতো এক শিক্ষাব্রতী মানুষ তাদের দেখা শোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৮১৯ সালে এই কলেজের প্রধান শিক্ষক দাঁসেম J.L.D' Anselme কে হিন্দু কলেজের উন্নতির বিষয়ে প্রস্তাব দিতে বলা হয়। তিনি এই কলেজের দৈনন্দিন পরিচালনা কেমনভাবে হতে পারে সে বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, পাঠশালা অংশে চোদ্দো বছরের বেশি বয়সের ছাত্র যেন না নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে কার্যকাল সাত ঘণ্টা হয়। এই পরিবর্তনটি করেছিলেন কলেজের পরিদর্শক বা ভিজিটার লুইসন সাহেব। এটি ১৮২৪ কিংবা ২৫ সালের ঘটনা। তখন রবিবারে ছুটি ছিল না। সপ্তাহের একটি দিন আধবেলা ছুটি থাকত।

হিন্দু কলেজে ছাত্র হিসাবে প্রথম কারা যোগ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তথ্যনির্ভর প্রতিবেদন আমাদের হাতে নেই। আসলে এই কলেজের এমন কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না যার দ্বারা আমরা সাইত্রিশ বছরের অকাল মৃত এই কলেজটি সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারি। তাই অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর দিনপঞ্জিকার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আবার কোনো সময় আনুমানিক বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হেনরি জেমস মন্তব্য করেছেন—১৮২৫ সালে ইংরেজ অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে ১৮২৭ সাল থেকেই ইংরাজ অধ্যাপক চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াতে শুরু করেন। এর আগে এদেশীয়রাই অধ্যাপনা করেছেন কি? জেমস বোধহয় সরকারি সিদ্ধান্তের কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্র ভোলানাথ চন্দ্র স্মৃতিচারণের মাধ্যমে বলেছেন—"হিন্দু কলেজের আদি ইতিহাস বাংলার মানুষের কাছে একটা মূল্যবান শিক্ষার পাঠ হয়ে আছে। প্রয়োজনীয় আয়োজন ছাড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কেমন ভড়ং, শক্তিবর্জিত সাহস কেমন ফাঁকা বড়াই অন্ধকারে ঝাঁপ দিলে কেমন চূর্ণাস্থি হতে হয়—সেই শিক্ষা। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা যাঁরা করে গিয়েছেন, তাঁরা সবাই সে যুগের শীর্ষস্থানীয় মানুষ, কিন্তু তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা অগ্রাহ্য করে পলকহীন, নকশাহীন হয়ে এক অজানা সমুদ্রে ভেসে বেড়াবার সাহস করেছিলেন। তাঁদের ইন্দ্রিয়ের নির্দেশে তাঁরা অগ্রসর হননি, কেবল চকিত দৃষ্টিতে বাইরেটা তাঁরা দেখেছিলেন। এ ছিল একটা জাতীয় কর্মোদ্যোগ, যার কোনো পূর্ববর্তী উদাহরণ ছিল না। তাঁদের সামনে কোনো সহায়ক তথ্য ছিল না। এর জন্য দরকার ছিল গণউদ্যম, নিজেদের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত তাঁরা দেখেননি, এর জন্য দরকার ছিল মেরু নির্দেশক যন্ত্রের নির্ভুলতা, কিন্তু স্থির লক্ষ্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ই ছিল না।"

একথা অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র উপায় নেই যে, ভোলানাথ বাবু হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্যোগ সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করেছেন। তবে এই মন্তব্য শুনে যদি আমাদের মনে হয় যে একদল মানুষ শুধুমাত্র হঠাৎ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে এমন একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তাহলে তাঁদের উদ্যমকে ছোটো করে দেখা হবে। তাঁরা হয়তো অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে এমন একটি শিক্ষা সংস্থা স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁদের সমবেত প্রয়াস যে বাংলা ও বাঙালির নবজাগরণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, একথা মানতেই হবে। আর এভাবেই তাঁরা বোধহয় সেই শাশ্বত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা হল, আন্তরিকতা এবং সততা থাকলে যে কোনো উদ্যম প্রতিবন্ধকতার পাহাড় ডিঙিয়ে সফলতার উপত্যকায় পৌঁছোতে পারে।

প্রথম কয়েক বছরে পাঠ্যপুস্তকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তখনকার দিনে শিক্ষা ছিল মোটামুটিভাবে স্মৃতিনির্ভর। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে। একদল

লেখক অনেক অনিদ্রিত রাত্রিবাহিত পরিশ্রমের মাধ্যমে একটির পর একটি পাঠ্যপুস্তক লিখতে শুরু করেন।

হিন্দু কলেজের শিক্ষক সমাজ সম্পর্কে অনেক ছাত্র গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁদের বেশির ভাগের স্মৃতিচারণে দু'জনের কথা বারবার ধরা পড়েছে—ডেভিড হেয়ার এবং রিচার্ডসন। অবশ্য হিন্দু কলেজের প্রাণপুরুষ হিসাবে আমরা 'ঝড়ের পাখি' ডিরোজিওকেই উল্লেখ করব। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা ডিরোজিওর অসামান্য কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোকপাত করব। হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিও এমনভাবে যুক্ত হয়ে আছেন যে, তাঁকে বাদ দিয়ে এই কলেজের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়।

হিন্দু কলেজের আদি পর্বের ছাত্রদের মধ্যে শিবচন্দ্র ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, অবিনাশ গাঙ্গুলি, চন্দ্রশেখর দে এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা পরবর্তীকালে বৌদ্ধিক অভিযানের ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য পুরুষ হয়ে ওঠেন। তাঁরা সকলেই হিন্দু কলেজিও শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণে আত্মমগ্ন ছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁরা নানাভাবে তাঁদের চারিত্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে হিন্দু কলেজের আদর্শকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহন করেছেন। হিন্দু কলেজের ঠিকানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে গড়ানহাটার গোঁরাচাদ বসাকের বাড়িতে এই কলেজটি স্থাপিত হয়। এখন সেখানে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলটি অবস্থিত। পরে তা চলে আসে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে। এখন এখানে বাবু হরনাথ মল্লিকের বাড়ি অবস্থিত। ব্রাহ্মসমাজের আদি ঠিকানা হল এটি। এরপর এই কলেজ টেরিটি বাজারে স্থানান্তরিত হয়। ১৮২৬ সালে চলে আসে পটলডাঙাতে। তবে এক্ষেত্রেও তর্কের অবকাশ আছে। পটলডাঙায় অর্থাৎ গোলদিঘির পারে যে অট্টালিকাটি স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে সংস্কৃত কলেজের শুভ সূচনা হয়। পরে রাজনারায়ণ বসু তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন— "১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবসে ওই অট্টালিকার মূল প্রস্তর গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট দ্বারা প্রোথিত হয়। ওই প্রস্তাবের উপরে খোদিত লিপি দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উক্ত মূল-প্রস্তর হিন্দু কলেজের নামে প্রোথিত হইয়াছিল।"

কিন্তু এখানে হিন্দু কলেজ অর্থে সংস্কৃত কলেজকে বোঝানো হয়েছে। কারণ তখন হিন্দু কলেজ শব্দ ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হত। গোলদিঘির পাশে এই ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের যে দুটি অনুষ্ঠান হয় তার বিবরণ পাওয়া যায় The Quarterly Oriental ম্যাগাজিনের জুন, ১৮২৪ সংখ্যাতে। সেখানে লেখা আছে 'প্রভেনসিয়াল গ্র্যান্ড চ্যাপলেইন' ব্রাদার ড: ব্রাইস খ্রিস্টমতে প্রার্থনা করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এটি হিন্দু কলেজের দ্বারা অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত কোনো অনুষ্ঠান নয়, কারণ হিন্দু কলেজের বাঙালি প্রতিষ্ঠাতারা কখনোই এমন প্রার্থনাকে অনুমোদন দিতেন না। এটি ছিল একটি সরকারি কলেজ। তাই ইউরোপীয় আধিকারিকরা যা ভাবতেন, সেই অনুযায়ী অনুষ্ঠান হত। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন—"তখনকার দিনে ভিত্তি বা বাস্তু-প্রস্তর উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইত। সংস্কৃত বা হিন্দু কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনও যথারীতি প্রতিপালিত হয়। এই দিন কী সমারোহ! সাহেব পাড়া হইতে নিজ বিচিত্র পোশাকে

'ফ্রিমেসন' গণ বাদ্যসহ মিছিল করিয়া যখন গোলদিঘির দিকে অগ্রসর হয় তখন কাতারে কাতারে রাস্তার দুইদিকে লোক দাঁড়াইয়াছিল। জনসাধারণ এই কার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করে।"

নতুন বাড়িতে পাশাপাশি দুটি কলেজ উঠে আসে—হিন্দু কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ। এই কলেজের জমি দান করেন ডেভিড হেয়ার। অবশ্য তিনি সামান্য কিছু টাকা নিয়েছিলেন। সরকার বাড়ি তৈরি করার জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিল। ধীরে ধীরে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকায় হিন্দু কলেজের কিছু ক্লাস বর্তমান কফি হাউসের হলঘরে চলে আসে। এখানে কয়েকটি ক্লাস ঘর তৈরি হয়েছিল। আর অধ্যাপকরা নীচের তলায় বসতেন। এখন তা বই ব্যবসায়ীরা দখল করে নিয়েছেন। ১৮৭৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের যে বর্তমান মূল ভবনটি তৈরি হয় তখন থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ পাকাপাকি ভাবে ওই ভবনে চলে আসে।

হিন্দু কলেজের মূল প্রতিষ্ঠাতা কে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অনেকে বলে থাকেন যে, রাধাকান্ত দেব এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আমরা জানি রাধাকান্ত দেবকে রক্ষণশীল বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিভূ বলা হয়। তিনি নাকি সমস্ত প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধাচরণ করে গেছেন। অথচ তাঁর চরিত্রের বেশ কিছু অচেনা দিক এখন ধীরে ধীরে আমাদের সামনে উঠে আসছে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি প্রত্যেক দিন কলেজে এসে কাজ দেখাশুনা করতেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এই কলেজের দৈনন্দিন কাজকর্ম কেমন চলছে তা জানতে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর আবার হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ডেভিড হেয়ারের কথাই বলেছেন। প্রসঙ্গত আমরা The Biographical Sketch of David Hare গ্রন্থটি দেখব। ডেভিড হেয়ার ছিলেন মুখচোরা স্বভাবের মানুষ, তিনি কখনও প্রচারের আলোর সামনে আসতে চাইতেন না।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, হিন্দু কলেজের আসল প্রতিষ্ঠাতা হলেন হাউড ইস্ট। এইভাবে হিন্দু কলেজ সম্পর্কে নানা পরস্পর বিপরীত মন্তব্য শোনা যা। অবশ্য অনেকে বলেছেন হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিশেষ কারও নাম করা উচিত নয়। যেমন, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হেনরি জেম। তিনি বলেছেন, আমরা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট—এই তিনজনকেই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দেব। রমেশচন্দ্র এই মত অগ্রাহ্য করে বলেন—১৮৬২ পর্যন্ত হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হেয়ার এবং হাইডের নামই আলোচিত হয়েছে। রামমোহনের নাম কখনও আসেনি। তাঁর মতে রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আদি পর্বের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

তখনকার দিনে যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হত, সেখানে যেসব প্রতিবেদন বেরিয়েছে, সেগুলি থেকে আমরা এই মতকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

হাইড ইস্ট ভদ্রলোক কে? তিনি ভারতের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে কেমনভাবে যুক্ত ছিলেন?